পাত্রীদের ভাবনা

ঢাকা প্রতিবেদন

আফসানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর ছাত্রী। সবেমাত্র স্নাতকে ভর্তি হয়েছে। তার বোনের বিয়ে হয়েছে বেশ কিছুদিন হলো। বয়স কম হওয়ায় সেই সময় বেশ ফুর্তি করেছিল আফসানা। মনে মনে ভেবেছিল বোনের মতো তারও বিয়ে হবে স্নাতক পাশ করার পর। কিন্তু তা হয়নি। কয়েকদিন আগে ইমিগ্রান্ট এক পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আফসানার। মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকলেও শেষ পর্যন্ত সব মেনে নিতে হয়েছিল এই তরুণীকে। আফসানার প্রশ্ন, কেন এমন হয়? পাত্রীর মনের কথা বিবেচনা না করে কেন অনেকটা জোর করে বিয়ে দেয়া হলো? বিয়ের ব্যাপারে কেন পাত্রীর ইচ্ছে হয়ে পড়ে অগুরুত্বপূর্ণ? ষাটের দশকে অবস্থা ছিল অন্যরকম। সেই সময় দেশে ডিগ্রী প্রাপ্ত ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে হতো মধ্যবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্তের। তৎকালীন সময়ে দেশের শিক্ষাঙ্গন ছিল মানসম্পন্ন। স্নাতক-স্নাতকোত্তর পাস করা ছেলেরা বেশ ভাল জায়গায় চাকরি করতেন। ভাল পরিবারের ছেলে হলে কদর আরও বাড়ত। সেই সময় দেশের বাইরে চাকরি এবং শিক্ষা হেতু দেশের বাইরে যেতেন গুটি কয়েকজন। এখনকার পঙ্গপালের মতো এতো বাঙালী দেশের বাইরে যেতো না। সুতরাং বাইরের প্রতিষ্ঠিত পাত্রের চাহিদা খুব বেশি ছিল না। দেশে পাস করা ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ডাক্তার তখন 'সুপাত্র'। কোন কোন শ্রেণীর কাছে সরকারী চাকুরী জীবিদেরও কদর ছিল।

অবস্থা বদলাতে থাকে সত্তর দশকের শেষ দিকে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিণ্ন সুযোগ সুবিধা বাড়তে শুরু করে। উচ্চ ডিগ্রীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে শুরু করে বিভিন্ন বৃত্তির কাগজপত্র। দেশের মেধাবী তরুণ শিক্ষকরা এই সুযোগ গ্রহণ করেন। আশির দশকে এই অবস্থা ফুলে ফুলে বড় হয়। চারিদিক থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবিদ ও শিক্ষকরা, আমেরিকা, বৃটেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যেতে শুরু করে। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এদেশের তরুণদের অনেকে গেছেন আইটি এবং কম্পিউটার কেন্দ্রিক পেশায়। বাইরের দেশগুলোর তালিকায় যুক্ত হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত, সিঙ্গাপুর, জাপানের নাম। বৈধ পথে লোক যেমন যেতে থাকল। অবৈধ পথেও গেল। দালালদের পাল্লায় পড়ে ভূয়া কাগজপত্র নিয়ে লোক গেল। অনেকে গেল স্বল্প মেয়াদের কাজ নিয়ে। অবৈধ 'যাত্রীদের' সংখ্যা বেড়েছে নব্বইয়ের দশকেই। আশির দশকে আমেরিকার গ্রীণ কার্ড এবং অন্যান্য দেশের নাগরিকত্ব পেতে অনেকেই বাইরে যেয়ে সেই দেশী বিয়ে করতেন। চুক্তি ভিত্তিক এই বিয়ে শেষ হয়ে যেত বাংলাদেশীদের নাগরিকত্ব পাওয়ার পরই। বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশী বেশির ভাগই বিয়ে করতে চান বাংলাদেশে। মহিলা বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মতে এই চাহিদা যতোটা না মনস্তাত্বিক, তার চেয়ে বেশি স্বার্থান্বেষী। ভিনদেশী স্ত্রীরা আইনাসুসারে বেশি সুবিধা পান এবং সেখানে স্বামী-স্ত্রীর সমানাধিকার। অন্যদিকে বাংলাদেশের বিয়েটি হয় ধর্মানুসারে। সেখানে স্বামীদের অধিকার বেশি। মেয়ে পক্ষের চিন্তাভাবনা থাকে ভিন্নরকম। ডলার-টাকার বিশাল ব্যবধানের কারণে ডলার বা পাউন্ড কামানো পাত্র পক্ষ সব সময়ই লোভনীয়। মাসে ১০০ পাউন্ড কামানো লোকটি হয়ে যান এদেশে বিশাল বিত্তবান। ভাল আয়ের এমন পাত্র নিয়ে তাই বেশ উৎসাহী হয়ে উঠে পাত্রী পক্ষ। অনেক সময় তারা ঠিক মতো খোঁজ খবরও নেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী বলেন, আমার বড় মেয়ে দেখতে বেশ ভাল। তার অনেক প্রস্তাব ছিল। আমরা শেষ পর্যন্ত আমেরিকায় এক বাংলাদেশী হোটেল ম্যানেজারের সঙ্গেই বিয়ে দিই। বিয়ের বছর কয়েক পরে জানতে পারি পরিচয়টা ভূয়া। আসলে সে হোটেলের সাধারণ কর্মচারী। প্রতারণার এমন ঘটনার পর মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত অনেকেই হয়ে গেছেন সর্তক। ইমিগ্রান্ট, গ্রীন কার্ডধারীদের ব্যাপারে তাদের মনে অজানা ভয় ঢুকে গেছে। বিবিএ পড়ুয়া মাছিয়ার মতে, 'চিনি না জানি না এমন লোকের সঙ্গে থাকব কিভাবে? এমন অনিশ্চয়তার সঙ্গে বিয়ের মতো বড় ব্যাপার মিলিয়ে দেয়া ঠিক নয়। খোঁজ খবর নেয়ার পরেও সমস্যা হতে পারে। তখন? তখন সাড়ে ১২ হাজার মাইল দূর থেকে আমার বাবা-মা তো আর সাহায্য করতে পারে না।'

অর্থনৈতিক সুবিধার কথা অবশ্য কেউই অস্বীকার করে না। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে সুন্দরী অনেক তরুণীর বাইরে বিয়ে হয়েছে। বিশেষ করে নিম্নমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের অভিভাবকরা তাদের সন্তানের সুখী জীবন কামনায় দেশের বাইরে নিয়ে গিয়েছেন। মেয়ের প্রবল আপত্তি এক্ষেত্রে অনেক সময় ধোপে টেকেনি। বৈদেশিক মুদ্রার আয়, বিদেশের জীবন যাত্রার কথাই প্রধান্য পায় বেশি। অভিভাবকদের এহেন আচরণে অবশ্য তাদের মেয়েদের দ্বারা সমর্থিত নয়। বিয়ে করে বাইরে থাকছেন প্রায় বছর দশেক হলো নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন গৃহীনী বলেন, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাই মুখ্য নয়। জীবনের অন্যান্য উপকরণও প্রয়োজন। দেশ থেকে এতো দূরে থাকতে সময় খুব নিঃসঙ্গ লাগে, বিশেষ করে যখন বিভিন্ন সমস্যায় পড়ি। বাবা-মার এ দিকটা চিন্তা করা উচিত ছিল। অভিভাবকদের সিদ্ধান্ত অবশ্য একেবারে অযৌক্তক বা ভুল এই রায় কেউ দেননি। প্রায় ৯০% বক্তা স্বীকার করেছেন নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের সুযোগ সুবিধা বিদেশেই বেশি। অনেকে আবার সুবিধা হিসেবে যোগ করেছেন চাকরির কথা। নিজের আয়ের সুবিধা বিদেশে বেশি। এদিকে দেশে পর্দা প্রথা, প্রচলিত রীতি নীতির কোন কোনটিকে তারা অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিগত দশ বছরে নিম্নমধ্যবিত্তের চিন্তাধারা অবশ্য খুব বেশি পরিবর্তিত হয়নি। অর্থনৈতিক মুক্তি, জীবন যাত্রার নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের সযোগ সুবিধা এখনও তাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আগের তুলনায় খোঁজ খবর নেয়ার উদ্যোগ বেড়েছে। তাদের তালিকায় 'ইমিগ্রান্ট' পাত্র এখনও শীর্ষে। উচ্চবিত্তের লোকেরা এক সময় বাইরে মেয়ের বিয়ে দেয়াটাকে স্ট্যাটাসের প্রতীক বলে ভাবত। সত্তর দশকের পুরোটা এবং আশির দশকের প্রথমভাগে এই চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখা যায়। তখন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মেধাবী পুরুষদের বিয়ের বাজার দর ছিল অন্যরকম। বিদেশী ডিগ্রীর সঙ্গে গ্রীণকার্ড থাকলে সেই সময় আর কিছু প্রয়োজন ছিল না। অনেক সময় আয়-রোজগারের অবস্থা নিয়ে পাত্রী পক্ষ মাথা ঘামাতো না। মেয়ে বাইরে থাকে এটাই ছিল স্ট্যাটাসের মূল প্রতীক। মুক্ত বাজারের যুগ শুরু হবার সময় থেকে এই অবস্থা বদলাতে শুরু করে। হোটেল, ট্যাক্সি, বিভিণ্ন অফিসে ছোট খাট চাকরিতে বহু বাংলাদেশী বাইরে যেতে শুরু করে। বাড়ে প্রতারকের সংখ্যা।

ভুল এবং আংশিক তথ্যের ওপর ভর করে বহু বিয়ে হয়েছে এ সময়। অর্থ উপার্জনের জন্য এদেশের লোকেরা বাইরে যেতে শুরু করলে বাইরের পাত্র স্ট্যাটাস প্রতীকটি হারায়। পাত্র দেশের বাইরে থাকে এই তথ্যটি হয়ে উঠে ডাল-ভাত খাবার মতো। আগের সেই জৌলুস, সেই কড়া বাজার দর আর থাকে না।

উচ্চমধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের অনেকে বাইরে পড়তে যাওয়া শুরু করলে আমেরিকা-বৃটেন সম্পর্কে বাংলাদেশীদের তথাকথিত স্বপ্নের বেলুন ফাটতে শুরু করে। বাইরের সমস্যা, জীবন যাত্রা, বিভিন্ন বাংলাদেশীর অবস্থা, লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মক্ষেত্রের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষ আরও ভালভাবে জানতে শুরু করে। পুরষদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মহিলাদের চিন্তাভাবনাও পাল্টে যেতে শুরু করে। আগে এদেশের শতকরা ৯০% মহিলা স্নাতক বড়জোর স্নাতকোত্তর পাশের পর সংসারকে ধ্যান জ্ঞান হিসেবে নিয়ে নিতেন। অনেকেই উচ্চ শিক্ষা খুব বেশি কাজে লাগাত না। স্কুল শিক্ষিকা, অফিসের ছোটখাট চাকরি ছিল তাদের জন্য বরাদ্দ, ষাট-সত্তরের দশকে মহিলাদের যে ভূমিকা ছিল, আশির দশকের মাঝামাঝি এমনকি শেষ পর্যন্ত তা খুব বদলায়নি। এ সময় সংসারে মহিলার প্রধান কাজ ছিল সন্তান লালন-পালন, রান্না-বান্না, আত্মীয়দের খোঁজ খবর নেয়া এবং স্বামীর সেবা করা। ভবিষ্যত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা থাকলেও সেই অধিকার ছিল না। তার ক্ষমতা ছিল সন্তান এবং রান্না ঘরকে ঘিরেই। এই অবস্থা পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে মেয়েদের স্বাবলম্বী হবার পর থেকে। উচ্চ শিক্ষা, নারী আন্দোলন এবং বিভিন্ন এনজিওদের ভূমিকা এক্ষেত্রে অপরিসীম।

এদেশের শীর্ষ স্থানীয় একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্রী লিজা বলেন, 'আমার মা কিভাবে জীবন কাটিয়েছেন ভাবতে অবাক লাগে, আমরা এখন চাইলে যে কোন ছেলের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারি। তাদের সমান আয়ের সুযোগ আছে। ইচ্ছে হলে প্রস্তাব বাতিল করতে পারি। অথচ মায়ের সময় সেই সুযোগ ছিল কম। তার আগের কথা তো ভাবাই যায় না।' বাইরের পাত্র সম্পর্কে তিনি যোগাযোগ উন্নতির কথা বলেন। তার মতে, ইমেইল, ইন্টারনেট, এই যুগে চেনাশোনা অনেকের বিদেশে থাকা, ইত্যাদির কারণে পাত্রের নাড়ি নক্ষত্র না হলেও অনেক খবর বের করা সম্ভব। যা আগে হতো না। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার সুবিধা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আত্মসচেতন হয়ে উঠে। অনেক মেধাবী ছাত্রীই এখন বিয়ের পর শুধু গৃহীনী হয়ে ঘর আলো করতে নারাজ। তারা আয় করতে চান। সংসারের সিদ্ধান্তে চান সমানাধিকার।

মধ্যবিত্তের পরিবারের বুশরা দারুণ চাত্রী ছিল। স্নাতক পাস করার পর তার বৃটেনে বিয়ে হয়। সেখানে সে প্রায় বছর খানেক ছিল। এর পর পালিয়ে দেশে চলে আসে। তার কথায়, 'দেখুন ছাত্রী ভাল ছিলাম। কাজ করার সুযোগও ছিল। কিন্তু আমাকে স্বামী কাজ করতে দেবে না। তার আয় সীমিত। খুব কষ্টে সংসার চলে। বিয়ের আগে বলেছিল কাজ করতে দেবে। পড়তে দেবে। এজন্য বাবা-মা রাজী হয়েছিল। অথচ পুরো অবস্থা পাল্টে গেছে দেশ ছাড়ার পর পর। আমি মনে করি এ বিয়ে আমার জন্য ঠিক ছিল না।' বুশরার ঠিক উল্টো অবস্থা হয়েছে অস্ট্রেলিয়াবাসী নাজিয়ার। যাবার মাস তিনেকের মধ্যে সে চাকরি পেয়েছে। স্বামীর চেষ্টায়। তিনি বলেন, আমরা দুজন বুঝেছি এখানে টিকে থাকতে হলে পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে। একজনের চাকরি আর অন্যজনের ঘর দেখা সিস্টেম এখানে অচল। সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমরা একে অপরকে সাহায্য করি। একে অপরের পরামর্শ নেই।

উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা প্রভাব ফেলেছে মেয়েদের চিন্তা ধারায়। ছেলেদের মতো তারাও এখন বিয়েকে একটি কর্তব্য মনে করে। তাদের কাছে এটা অপরিহার্য নয়। কারণ তারা আত্মনির্ভরশীল। সদ্য বিবাহিতা নাজনীন বলেন,'ভাল চাকরি দেশের মধ্যে পেলে বাইরে যাবার দরকার কি? দেশে প্রতিষ্ঠিত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হলে তো সুবিধা। বাবা- মাকে ছেড়ে যেতে হয় না, প্রয়োজনে তারাও আমাকে কাছে পায়।' বাবা-মাকে কাছে পাবার ব্যাপারটি ছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু ব্যাপার মেয়েদের বাইরে বিয়ের নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মনস্তাত্ত্বিক দিকে সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলেছে সাড়া জাগানো রোমহর্ষক 'সীমা হত্যা'। ইমিগ্রান্টদের সুনাম নষ্ট করেছেন সেই মুনির। সব ইমিগ্রান্ট এক না। এটা সত্যি, কিন্তু সর্তক হলে তো আর সমস্যা নেই। এই সর্তকতাই অনেকের মনে নেতিবাচক প্রভাব, ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। বহু দিন বিদেশে কিংবা বাইরে জন্ম এমন বাংলাদেশীদের প্রতি মধ্যবিত্তের আগ্রহ গেছে কমে। অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা থাকলেও এদেশের মেয়েরা তাদের বিয়ের তালিকায় এমন বরকে বেশ নিচে জায়গা দিয়েছে। এর মূল কারণ অতীতে অনেকের কাছে শোনা সামাজিক রীতি নীতি মানিয়ে নেয়া কষ্ট। এনজিওতে চাকুরিরত সীমা বলেন, 'অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা তো আর সব নয়। মানিয়ে চলার ব্যাপারও আছে। এ দেশের অনেক নিয়ম নীতি বিদেশে অচল। আবার বিদেশের বেশ কিছু রীতিনীতি এদেশের অনেকের কাছে বেমানান।'

কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট একটি বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক রীতিনীতি সমস্যা সৃষ্টি করে এটা সত্য। নতুন দেশে থাকতে গেলে বিবাহিত বা অবিবাহিত প্রত্যেকেরই কম বেশি সমস্যা হয়। তবে মেয়েদের জন্য সমস্যা আরও বাড়ে যখন তাদের স্বামীরা আশা করে নতুন জায়গায় এসে তারা একবারে সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেবে। সহজভাবে সব গ্রহণ করতে পারবে। পারস্পারিক সহযোগিতার এই সমস্যা দূর করা সম্ভব, তবে একক প্রচেষ্টায় নয়। অনেকের ধারণা স্বামীরা এই কথাটি বুঝতে চাননা। বোঝার চেষ্টা করেন না। স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক বোঝাপড়ার সমস্যা ছাড়াও বিদেশে স্বামীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় মানসিক সাপোর্ট পাওয়া যায় না, এমন অভিযোগ করেছেন অনেকে। এক্ষেত্রে স্বামীরা কাজের চাপকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেন। বিদেশে নিঃসঙ্গ থাকার ফলে মানসিক সাপোর্ট আরও বেশি দরকার হয়, দেশে ঘনিষ্ট জনের কাছাকাছি থাকেন বিধায় সমস্যাগুলোতে সাহায্য পাওয়া যায় সহজে।

উচ্চমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের পাত্রীরা আগামীতে ইমিগ্রান্ট পাত্রদের জন্য কঠিন শর্ত আরোপ করতে পারে। ঢাকায় বেশ কয়েকটি বিয়েতে আধুনিকারা পাত্র পক্ষের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট চেয়েছেন। তাদের যুক্তি খুব সাধারণ। 'যেহেতু সারাজীবন একসঙ্গে থাকব, এক্ষেত্রে পাত্রের সমস্যা জেনে নেয়া উচিত।' বলেছেন সবে আমেরিকা থেকে পাস করে আসা সেতু। 'শুনেছি আগে পাত্র পক্ষ সম্ভাব্য পাত্রীর গানের গলা, হাঁটার ভঙ্গি, রান্নার হাত ইত্যাদি পরখ করতো। আমি তো আর সেগুলো দেখতে চাইনি। শুধু কোন জটিল রোগ আছে কিনা তা জানতে চেয়েছি,' এভাবেই নিজের দাবীর সপক্ষে যুক্তি দাড় করিয়েছেন সেতু। অধিকার সচেতন হলে এমন তার আরও দাবী উঠতে পারে। যেগুলো হয়তো পাত্র পক্ষকে ইচ্ছে না থাকলেও পূরণ করতে হবে। যেমনটি করতে হয়েছে অনেক পাত্রীকেই।

নব্বইয়ের মাঝামাঝি পরের অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেনি। বিদেশে বসবাসকারীদের চাহিদা এখনও আছে। তবে কিছু সতর্কতা, নিয়মকানুন যোগ হয়েছে। পাত্রদের ক্ষেত্রে এখনও শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্থনৈতিক এবং পারিবারিক অবস্থান অগ্রাধিকার পায়। উচ্চমধ্যবিত্তের চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়েছে। বেশিরভাগই দেশে প্রতিষ্ঠিত পাত্র পছন্দ করেন। মধ্য ও নিম্নবিত্তের পছন্দ এখন ইমিগ্রান্টরা। উচ্চবিত্তে রয়েছে মতামতের সংমিশ্রণ। ০

ঢাকা
ডিসেম্বর ২৫, ২০০১।

তোমার জীবন হয় অকস্মাৎ বিয়ের কাতান

জাকিয়া আফরিন

ছোটবেলায় 'আমার জীবনের লক্ষ্য' রচনা লিখতে গিয়ে আজ অব্দি কেউ গৃহিণী হবার কথা উল্লেখ করেছে কিনা জানা নেই। তবু কেমন করে জানি শতকরা আশি ভাগ বাংলাদেশী নারী এখনো গৃহিণী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে অনেক কম বয়স থেকে। বিয়ে করে প্রবাসে আসা নারীদের অবস্থা আরও করুণ। সব ধরনের চাকরি এখানে দুর্লভ, বাংলাদেশের ব্যাচেলার ডিগ্রী বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত নয়, ডাক্তার এখানে এসে চাইলেই প্র্যাকটিস শুরু করতে পারবেন না, এমনি হাজারো অসুবিধা। তবু প্রতি বছর মেয়েরা গৃহিণী হয়ে আসছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আসছে দলে দলে। কেউ ক্যারিয়ারের গন্তব্য পাল্টাচ্ছে, কেউবা পুরো পথটাই বদলে ফেলছে। শুধু এক অমোঘ আকর্ষণ - সংসার। সংসারের প্রতি এই অবুঝ ভালবাসাই যে নারীদের টেনে এনেছে দুরন্ত প্রবাসে, আমরা কথা বলেছি তাদেরই কজনের সঙ্গে - ভালই আছেন ওরা।

টুসির সরল স্বীকারোক্তি ঃ

'ভালই আছি। কিন্তু কিছুতেই এখানে দেশের আমেজ আসেনা। এইতো ঈদের দিনে পোলাওয়ের গন্ধই যেন পেলাম না। দেশে ঈদের দিনে খাবারের সুন্দর গন্ধ - এখানে একটুও পেলাম না।' টুসি শারমীনের মিষ্টি আওয়াজে একটু যেন বিষণ্ণতা। টুসি বলছিল তার আমেরিকায় আসার কথা - 'মেডিকেলের ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল। বাবার কলিগের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব আসলো। ভাল করে চিন্তা করার সময় ছিলনা। দেখা করে ভাল লাগল। বিয়ে করে ফেললাম।' যাকে বলে চূড়ান্ত রকমের সেটেল্ড্ ম্যারেজ - টুসির হয়েছিল তাই। বিয়ের মাসখানেক পরই স্বামীর হাত ধরে ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছে গেল সে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। সংসারের সৌন্দর্য আর স্বস্তির এই জীবন নিয়ে টুসি ভারী পরিতৃপ্ত। তবে জীবনের কাছে তার চাওয়া শুধু এটুকুই নয়। বাংলাদেশ থেকে মেডিসিন পড়া শেষ করে সফল একটা ক্যারিয়ারের স্বপ্ন দেখেছিল সে। আমেরিকায় তার জন্য এই স্বপ্ন অনেক দূরবর্তী। 'তিনটা কঠিন পরীক্ষা পাশ করে তারপর তিন বছরের ইন্টার্নী হওয়ার সুযোগ পেতে পারি। পরীক্ষার প্রিপারেশনে সময় লাগবে অনেক। আর তারপরও ইন্টার্নশিপ পাবার কোন গ্যারান্টি নেই। তাই কষ্ট হলেও ডাক্তার হবার চিন্তা বাদ দিয়েছি।' কষ্টসাধ্য বলে টুসির সফল ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে নয়। জানুয়ারী মাস থেকেই কয়েকটি ক্লাস নেবার কথা ভাবছে সে। তারপর পছন্দসই একটা বিষয়ে মাস্টার্স শুরু করবে। জীবনের প্রায়োরিটি লিস্টে সংসার প্রথম দিকে আসলেও পড়াশোনা বাদ দিতে রাজী নয় সে। টুসির ভাষায় - 'নিজের সন্তুষ্টির জন্যই পড়াশোনা শেষ করতে হবে আমার। ডাক্তার হবার জন্য ৫ বছর অনেক কষ্ট করেছি। কিন্তু তা যখন সম্ভব হলো না, অন্য কিছু করতে হবে। নইলে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাব।' সময় আর প্রয়োজনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নিজের সিদ্ধান্তগুলো একটু পাল্টে নিয়েছে টুসি। তাই জীবন চলছে নিজের গতিতে। শুধু একটু শূন্যতা যে কোন প্রবাসীর মতই - 'বাবা, মা যদি এখানে থাকত, তাহলে খুব ভালো লাগত। শুধু এরজন্যই মনে হয় দেশে চলে যাই। এখানে বসে শুনতে খুব খারাপ লাগে - ওর শরীর খারাপ, এ মারা গেছে। কিন্তু কি করব, এটাই এখন আমার জীবন, ভালোই আছি।'

সব পরিবেশে এমনি করে মিশে যাবার সৌন্দর্যই বুঝি নারী।

কবিতা এখন অন্যরকম ঃ

ছাত্রজীবনে মিছিলে শ্লোগান তুলতে তুলতে কখনো কবিতা ভাবত - রাজনীতিতে জীবন উৎসর্গ করলে মন্দ হয়না। কিছুদিন সেই অজনপ্রিয় পথে চলাফেরা করে কবিতা ততদিনে বুঝে গেছে - সত্যিকারের রাজনীতি করতে গেলে সংসারে মন দেয়া যাবে না। 'তাই বুঝি একটু করে পিছিয়ে আসা। সংসারী থেকে যতটুকু করা যায়। শুধুমাত্র সেটুকু চালিয়ে যাব ভেবেছিলাম' - ওকলাহোমার গোছানো অ্যাপার্টমেন্টে বসে সুন্দর গুছিয়ে বলছিল কবিতা। বছর দুই থেকে স্বামীর সাথে এখানেই সে। পুরোপুরি গৃহবধূ বলা যাবে না - কবিতা কাজ করে দিনের বড় একটা সময়। তারপর ঘরে ফিরে গেরস্থালী করতে করতে রাজনীতির কথা ভাবারও সময় হয়না তার।

প্রবাসে নবাগতা এক নববধূ

তবে এই তার পছন্দের জীবন। আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলল - 'এখানে খুব ভাল লাগে। মানুষের জীবনযাত্রা সুন্দর, সারাক্ষণ কর্মব্যস্ততা। কেউ শুধু শুধু বসে নেই। কর্মঠ মানুষই আমার ভাল লাগে।' তবু আলসেমির সেই সময়গুলো তার স্মৃতিতে উজ্জ্বল - 'দেশে থাকলে কি যে মজায় সময় কাটাতাম। সারাদিন আড্ডা। এর ফাঁকে কাজ। এখানে পানিটা এগিয়ে দেয়ার মানুষ নেই। অসুস্থ হলে নিজের সেবা নিজেই কর। এই কষ্ট মানতে পারিনা।' টুসির মত কবিতাও বলেছে একাকীত্বের কথা - 'এখানে একটামাত্র কারণেই ভাল লাগেনা। আত্মীয় স্বজন সব বাংলাদেশে। কজনই বা বন্ধু হয়েছে আমেরিকায় এসে। গুটিকয়েক। ঘুরেফিরে সেই কয়েকজনের সঙ্গেই

১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

পাত্রসমাচার

নাহিদ জামাল রিয়ানন

সংস্কৃতি ও মানুষের মন এক সুতোয় গাঁথা। আর তাই মনের মানুষের খোঁজ পাবার আশায় আমাদের ছুটে যেতে হয় ফ্যাশন, সংস্কৃতি, আপন সমাজের কাছে হয়তো, হয়তো নয়। আমেরিকায় বসবাসরত সব পাত্ররাই কি এই আশাতেই দেশে পাত্রীর খোঁজ লাগান? তাছাড়া শুধু খোঁজ করলেই তো হ'ল না, ভিসা সমস্যা, চাকরিতে ছুটি সমস্যা, মনের মাঝে উত্তেজনা আর স্বপ্নের অনুভূতি, নতুন জীবনের প্রত্যাশা, সামাজিক ও দাম্পত্য জীবনে মন ও পরিবেশ মিলিয়ে দু'জনের মাঝে যোগাযোগ আর সমন্বয়ে সমস্যা আরো কত কি? প্রবাসী পাত্রদের মনের মত পাত্রী খুঁজে পাবার আশা ও তা পূরণে সফলতা আর ব্যর্থতা নিয়েই আমাদের আজকের প্রতিবেদন। কথা হলো কয়েকজন আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী যুবকের সাথে যারা সদ্য দেশ থেকে বিয়ে করে এসেছেন অথবা ভবিষ্যতে দেশে যেয়ে বিয়ে করার কথা ভাবছেন। তাদের কথায় পাত্রদের মনের ছবি দেখার চেষ্টা করা যাক।

আমাদের সাথে কিছুদিন আগে বিয়ে করে এসেছেন এমন যাদের সাথে কথা হলো তাদের মাঝে প্রায় সবারই বিয়ে করতে যাবার আগেই পাত্রী মোটামুটি ঠিক ছিল। কেউ কেউ দেশে যেয়ে কয়েকজনের মাঝে একজনকে বাছাই করেছেন, কেউ কেউ এদেশে থেকেই ছবিতে পাত্রী পছন্দ করে শুভ দিনের দিন তারিখ ঠিক করে, সেই অনুযায়ী দেশে রওনা হয়েছেন। সময় মত বিয়েটা সেরে আবার ছুটি থাকতে থাকতেই ফিরে এসে কাজে যোগ দেয়া এদের প্রত্যেকের কাছে একটি অতি জরুরী বিষয়। আমেরিকাতে চাকুরিরত সবার কাছেই এই ছুটি বিষয়টি খুবই মূল্যবান, সেকথা যারা এদেশে থাকছেন তারা একবাক্যে স্বীকার করে যাবেন। আর তাই এই সদ্য বিয়ে করা আসা নতুন বরদের সবার কথায় এই বিবাহ যাত্রা এবং কম সময়ে সব কিছু শেষ করে ফিরে আসাটা একটা কম্য বটে! আর যারা পাত্রী ঠিক করে যাননি অথবা যাবার আগে বিয়ে করবেন কি করবেন না সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারেন নি, তাদের কাছে সময় বিষয়টি একটি হ-য-ব-র-ল জাতের উৎপাতও মনে হয়েছে বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। শুধু যে বিয়ে বাড়ি সামলাতে সময় লাগে তা নয়, এরপরেও রয়েছে মনোবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্যা। নতুন কপোত-কপোতি যারা বিয়ের আগে হয়তো দু'জনের চোখে চোখ রাখার সুযোগ পাননি অথবা যাদের অবস্থা 'তারে আমি চোখে দেখিনি, তার গল্প শুনেছি, আর লুকিয়ে লুকিয়ে ছবির দিকে তাকিয়ে থেকেছি', তাদের কাছে দু'জনের নিবিড়তা তৈরি করার ফাঁক-ফোঁকড় বের করা বিয়ের আগে লুকিয়ে প্রেম করার চাইতেও বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। নতুন দম্পতিদের একেকজনের দাঁত মাজার অভ্যেস, ক্ষিদে পাবার সময়, চা কি খালি পেটে না ভরা পেটে ইত্যাদি দুধভাত বিষয় থেকে শুরু করে দু'জনে একসাথে আমেরিকায় ফিরবে, নাকি বউ পরে আসবে, পরে এলে কবে, কিভাবে ইত্যাদি ইত্যাদি নানান রকমের অভাবনীয় ঝামেলা এসে হাজির হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তারপর রয়েছে দাওয়াতের ধুম। আমাদের সমাজে নতুন দম্পতি বলতে গেলে পারিবারিক এবং সামাজিক সম্পত্তি। তাদের যে যখন যেভাবে যেখানে যেতে বলবে, যা খেতে বলবে তাই করাটাই একটা সামাজিক দায়িত্ব। এই সব সামাজিকতার ফাঁকে নব দম্পতির হৃদয়ের আঙ্গিনায় বিয়ের পরে প্রেম বিষয়ক যে চারাগাছটি তর তর করে বেড়ে উঠতে থাকে তাকে ঢেকে রাখাও এই নতুন বরদের একজনের মতে, 'রীতিমত যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু নয়'। এই যন্ত্রণা একবার শুরু হলে আর থামাথামি নেই, বরং বেড়েই চলে, বিশেষ করে সে যদি হয় সমুদ্রের এপার ওপার প্রেম। বউ দেশে গেলে আসার মনোকষ্টের সাথে প্রতিমাসে ফোন বিলের সাথে যে বুকের ব্যথা সহ্য করতে হয়, তার চেয়ে কারো কারো মতে, বউ সাথে নিয়ে আসার সুবিধা না থাকলে দেশে গিয়ে বিয়ে করাটাই ঠিক নয়। এইসব নববিবাহিত বরদের অনেকের মতেই এই সময় সমস্যাটির আর একটি বিপদজনক দিক হলো সময়ের অভাবে মনের আকাংখা বা প্রত্যাশার পূরণ না হওয়া। তাদের কারো কারো মতে, সময়ের অভাবে যেমনি মনের মত পাত্রী খুঁজে বেড়ানো সম্ভব হতে না পারে, তেমনি পরিবারের সবার সাথে মত মিলিয়ে মনের মত বিয়ের অনুষ্ঠান করাও অনেক সময় অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে আমাদের সামাজিক পরিবেশে এসব কারণে দু'পক্ষের মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়াও এমন কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

সময় সমস্যার পর যে সমস্যাটির কথা অনেকেই বলেছেন তা হলো নববধূর ভিসা পাওয়া না পাওয়ার বিষয়। যদি কারো অস্থায়ী চাকুরির ভিসা, অর্থাৎ এইচ-১ ভিসা থাকে তবে আগে অনেক সময় মাস খানেক দেশে থাকলে স্ত্রীর জন্যে ভিসা'র ব্যবস্থা করে আসা যেত। বর্তমানে বাংলাদেশে আমেরিকান কনস্যুলেটে পূর্ব নির্ধারিত ইন্টারভিউ ছাড়া ভিসা নিতে যাওয়া যায় না বলে, আগে থেকে সব কিছু ঠিক না করে দেশে বিয়ের পর পর নব দম্পতির একত্রে আমেরিকায় ফিরে আসার ব্যাপারটা একটু জটিল ও সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই ভিসা সমস্যা নিয়ে প্রবাসী নতুন বরদের পক্ষ থেকে যারা পাত্র হিসেবে দেশে যাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে দেয়া উপদেশ বাণী হল, ''সিটিজেন না হয়ে দেশে বিয়ে না করতে যাওয়াই ভাল''। অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন পাত্র উচচ শিক্ষারত অবস্থায় দেশে যেয়ে বিয়ে করে আসেন। এই সময় ছাত্রাবস্থায় আমেরিকায় অভাব বা বিভিন্ন অপেশাদার কাজ, যেমন রেস্টুরেন্টের কাজ, কনভেনিয়েন্ট স্টোরে ক্যাশিয়ারের কাজ ইত্যাদি করে জীবন ধারণ করেন যা বাংলাদেশে অবস্থানরত মেয়ের পরিবারের কাছে বোধগম্য হতে একটু অসুবিধা হতে পারে। 'পড়াশোনার শেষে একটা ভাল চাকুরি মিলে গেলেই এই অস্থায়ী জীবনধারণ ব্যবস্থার সমাপ্তি হবে' এ বিষয়টি যদিও ধীরে ধীরে প্রবাসী পাত্রদের সম্বন্ধে একটি প্রচলিত তথ্যে পরিণত হচ্ছে, এ ব্যাপারে আমাদের প্রবাসী পাত্রদের মন্তব্য, তাঁরা এ বিষয়ে স্পষ্ট ও সত্যভাষী হতে চান। এটাই এই সমস্যা ও ভুল বোঝাবুঝি দূর করার সহজ সমাধান হতে পারে বলে তাঁরা মনে করেন। এদেশে বলতে গেলে সবাই গাড়ি হাঁকিয়ে কাজে যায়, আবার প্রায় সবাই জীবনের কোন না কোন সময় অপেশাদার কাজ করে থাকি। এতে ভবিষ্যত পেশার কোন ক্ষতি হয় না, একথাটি দেশের মানুষকে পরিস্কার বুঝতে দেবার সুযোগ দিলে হয়তো তারা বুঝবে, তবুও শুরুতে পাত্র হিসেবে এমন একটি তথ্য মেয়ে পক্ষের কাছে একটি

ভুরু কুঁচকানো প্রশ্ন হতেই পারে বলে একজন মন্তব্য করেন।

দেশে যেয়ে বিয়ে করার কারণ কি জানতে চাইলে প্রথম যে বিষয়টি বেশির ভাগ ছেলে তুলে ধরেন তা হলো, তাঁরা নিজেদের সাথে খাপ খাওয়ানোর মত নিজ সংস্কৃতির একজন সঙ্গী খুঁজে পেতে চান। তাছাড়া অনেকের মতে বিদেশে বিদেশী মেয়ে বিয়ে করলে সেই জীবনের ভবিষ্যত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনিশ্চিত। দেশী মেয়ে যে বিদেশে একেবারেই মেলে না তা নয়, তবে বিয়ে পাকাপাকিতে এতে মুরুব্বীদের অংশগ্রহণ কম হওয়ায়, পরিবারের সবার মতের সাথে মিলিয়ে পাত্রী পেতে হলে দেশে যেয়ে বিয়ে করাই শ্রেয় বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। এদেশে থাকতে যেয়ে এই সব পাত্রদের মনে সময়ের সাথে তাদের মানসিকতার কিছুটা পরিবর্তন হতেই পারে। এই পরিবর্তন যেমন মনের উদারতা বাড়াতে পারে, তেমনি দেশের সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সার্বক্ষণিক পরিচয় না থাকায়, দেশে বসবাসরত পাত্রীটির মনের পরিচয় পাওয়া বিদেশ থেকে যাওয়া পাত্রটির কাছে দুরূহ মনে হতে পারে। তদুপরি বিয়ের পূর্বে পরিচয় না থাকলে এবং খুব কম সময় নিয়ে দেশে বিয়ে করতে গেলে, নব দম্পতির মাঝে ভাবের আদান প্রদান ও দু'জনের মন বোঝাবুঝির বিষয়টি একটি কঠিন কাজে পরিণত হতে পারে। তবে এ বিষয়ে একজন নব বিবাহিত বরের মতামত অনুযায়ী, দু'জন দু'জনকে বুঝতে সময় লাগলেও, বাংলাদেশী মেয়েরা এ যুগেও গতানুগতিক বাঙালী নারী চরিত্রের চাইতে খুব একটা ভিন্ন চরিত্রের হয় না বলে যে কোন সংসার, যে কোন মানসিকতার বর আর পরিবেশের সাথে মিলিয়ে নিতে তাদের খুব একটা বেগ পেতে হয় না। অনেকেই এই কারণেই এখনো দেশে গিয়ে বিয়ে করে আনা বউদের নিয়ে সংসার করা এদেশীয় সংস্কৃতিতে বড় হওয়া মেয়েদের তুলনায় সহজ বলে অনেকে মনে করেন বলে জানিয়েছেন।

প্রবাসী পাত্রদের মতে দেশে গিয়ে বিয়ে করার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাদের নিজেদের পারিবারিক মতামতের প্রাধান্য দেয়া ও তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। প্রবাসী পাত্রদের কারো কারো বাবা-মা আমেরিকাতে থাকলেও, বেশির ভাগের পরিবার পরিজনই থাকেন বাংলাদেশে। তাছাড়া মেয়ে যদি দেশে থাকে, তবে সে পক্ষের মানুষজনও বিয়ের অনুষ্ঠানটি দেশে পালন করাটাই শ্রেয় মনে করবেন বৈকি! এ বিষয়ে বেশির ভাগ বিয়ে করে আসা বরের মন্তব্য হলো, দেশে যেয়ে বিয়ে করলে বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এদের সবার সাথে যেমন জীবনের এই বিশেষ উপলক্ষের আনন্দ আর উত্তেজনা ভাগ করে নেয়া যায়, তেমনি তাদের সবার সহায়তায় বেশ আন্তরিক আর দেশীয় সংস্কৃতির পরিবেশে উৎসবটি সুন্দরভাবে শেষ করা যায়।

যারা দেশ থেকে বিয়ে করে এসেছেন তাদের কাছ থেকে, যারা ভবিষ্যতে দেশে বিয়ে করতে যাবেন বা এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছেন তাদের জন্যে দেয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ হলো, "হাতে প্রচুর সময় নিয়ে যেতে হবে, অথবা সব বন্দোবস্ত আগে থেকে ঠিক করে যেতে হবে, যাতে বিয়ের আসরে বসে কোন্ কাজটি এখনো বাকী, তা চিন্তা করতে না হয়।"

সর্বোপরি প্রায় সকল প্রবাসী পাত্রই এক কথায় যে কথাটি বলেন, সেটি হলো, তাঁরা যতই দেশের বাইরে থাকুন না কেন, ছোটবেলায় যে সংস্কৃতির মাঝে তাঁরা বড় হয়েছেন, সেই সংস্কৃতি, আর তাঁদের নিজস্ব জীবন ধারণ পদ্ধতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্যে একজন মনের মানুষ খুঁজতে হলে নিজ দেশের চাইতে ভাল জায়গার সন্ধান কেউ দিতে পারবে বলে মনে হয় না। ০

হিউস্টন, টেক্সাস
নভেম্বর ২৩, ২০০১।

তোমার জীবন হয় ... ১৫ পৃষ্ঠার পর

কথা, দেখা করা। বাংলাদেশে পরিচিত মানুষের অভাব নেই। প্রয়োজন পড়লে কতজন পাশে এসে দাঁড়ায়!' ভিন্ন কালচারে মেশার অসুবিধার কথাও উচ্চারণ করলেন কবিতা। আরও বললেন গুরুত্বপূর্ণ এক সত্য - 'এই দেশে থাকতে গেলে ঘরের কাজ স্বামীকেও করতে হয়। কারণ এক জিনিষ একা সামলানো যায়না। বাংলাদেশে অল্প টাকা খরচ করলেই আমরা কাজের লোক পেয়ে যেতাম। এখানে তো তা হবেনা। তাই দু'জনে মিলেমিশে কাজ করি। কষ্টও হয়না।' সংসারী কবিতা এখন ইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি অঙ্গন থেকে লক্ষযোজন দূরে। কিন্তু এজন্য কোন ক্ষোভ নেই তার। মেনে অথবা মানিয়ে নিয়ে এখন সে খুশি।

চঞ্চলমতি মলির ছোট্ট বাসা ঃ

কুষ্টিয়া শহরের চঞ্চলমতি সেই মেয়েটি আমেরিকায় এসে কান্নাকাটি করেছে প্রচুর। মাত্র ক'মাসই হল তার প্রবাসী জীবন। আত্মীয় কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে খারাপ লাগা আরও যেন বেড়ে যেত। 'ওদের দেখতে পাচ্ছি না কেন!' - ওর এই প্রশ্নের উত্তরতো নেই। কান্নার রেশ কমলে নিজেই বুঝেছে জীবনটা এমনই। তাছাড়া বিদেশে আসা নিয়ে ওর আপত্তি ছিল না কোন। 'আমার বড় আপুর বিয়ে হয়েছে সিঙ্গাপুরে। অনেক দিন পর পর ও বেড়াতে আসলে দেখতে পেতাম কত আদর পাচ্ছে। আমিও তাই ভেবেছি বিদেশে থাকলে মজা হবে। তাই এখানে আমার খারাপ লাগে না।' তবে মলির জন্য ছোট্ট একটা দুঃসংবাদও ছিল। বাংলায় অনার্স ডিগ্রী তাকে এই দেশে সাহায্য করবেনা একটুও। একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে তাকে। 'আমার অনেক আগ্রহ ফ্যাশন ডিজাইনিং-এ। জানুয়ারী থেকে তাই শুরু করব ভাবছি।' মলির আশাবাদ।

'পিতৃতন্ত্র নারীর জন্য রেখেছে যে পেশাটি, তা বিয়ে ও সংসার; এই পিতৃতন্ত্রের নির্ধারিত নারী নিয়তি' - হুমায়ুন আজাদ। তো এমনই আছেন আমাদের প্রবাসী গৃহিণীরা। সুখী, খুশি, এবং সন্তুষ্ট। আত্মীয় স্বজনদের ছাড়া আর তেমন কিছু মিস করেন না তারা। ঢাকা শহরের আকাশে কালো ধোঁয়া থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দিত, গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়ার সেই আগুন সৌন্দর্য তাই যেন মনে পড়ে না। তবু এটাই বাস্তবতা। প্রবাস জীবনে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছেন সবাই। জানি না সিমোন দ্য বুভোঁয়া সত্যি বলেছিলেন কিনা - The conveniences of masculine support are very tempting in comparison with the risks of a career and with discipline implied by all real work। তবে আমি হতাশাগ্রস্থ মানুষ নই। ভাবতে চাই - এই নারীরা সবই করছেন ভালবাসার জন্য, আত্মসন্তুষ্টির জন্য। এমনি কিছু ভালমানুষ না থাকলে সমাজ চলবে কি করে! ০

স্যান হোজে
ডিসেম্বর ২০, ২০০১।

'পড়শী'তে আপনার পণ্যের
বিজ্ঞাপন দিন
বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য
আমাদের ওয়েব সাইটে আসুন
www.porshi.com

পড়শী'র পাত্রযোগ

শিহাবউদ্দীন কিসলু

বিষণ্নতা যখন রোগ, পড়শীই মেডিসিন, প্রথম ভরসা। প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ। প্রথমে চোখে চোখ, চোহারায় সামান্য মনের ভাব হালকা আদান প্রদান অত:পর চাওয়া পাওয়ার হিসাব। লেনদেন। চেহারা বলে দেয় ভেতরটা কেমন। তবুও ভালো লাগা ভীষণ ব্যক্তিগত। ভাল লাগা থেকেই শুরু, প্রেম তারপর ভালবাসা, গভীর নিবিড়। তাই সুযোগ হাতছাড়া হওয়া বা করা - বিরহ বেদনা যন্ত্রণার উপসর্গ। ভালবাসার কাঙাল আমি। তবে পেতে নয় দিতেই। দেবার জন্যই তো আসা। পড়শী বন্ধু থেকে সঙ্গীও হতে পারে সহজেই।

পড়শীকে আমার ভাল লাগে। যখন আমার ভীষণ একাকীত্বে - ভাল লেগে গেছে প্রথম দর্শনেই। এমন সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করা যায় না। ভাল লাগার মত, ভালবাসার মত। অভিভূত হবার মত না হলেও পড়শীর চেহারায় আভিজাত্য প্রচন্ড আকর্ষণে আমাকে শুধুই কাছে টানে। কথা বলা, আদান প্রদানে প্রচন্ড উৎসাহিত করে। পড়শীর লাবণ্যে আমি মুগ্ধ। আমার কাছে অবশ্য ভেতরটাই মুখ্য। দিব্যচক্ষুতে অন্তরটাকেই খোঁজার চেষ্টা করি। তবুও 'ফেস ইজ দি ইনডেক্স অব মাইন্ড।'

সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে পড়শীর কথা বলা - বিশুদ্ধ উচ্চারণ আমাকে আকর্ষণ করেছে প্রথম দর্শনেই। পাশাপাশি দেহ সৌষ্ঠব। পরিপাটি পোশাকে সুস্বাস্থ্য যথার্থ। অপ্রয়োজনীয় বাড়তি মেদ নেই এতটুকু। ভেতরটাই তো আসল, মন নিয়ে তাই কথা। কথায় মনের রং মিশে কি? পছন্দের একশো ভাগ মিল না পেলেও মিলের পরিমাণে মিল ঢেকে দেয় অমিলকে। এক সৌম্য শুভ্র চেহারায় কত শান্ত রঙের আবেশ। সমুদ্রের মত গভীর আর আকাশের মত বিস্তৃত পড়শীর পছন্দ।

আমার আবার প্রকৃতির প্রতি দুর্বলতা দুর্বার। কিছুই শক্ত ধরে রাখতে পারেনা এ মনকে। ঘর থেকে বেরুলেই যে চুম্বকের অমোঘ সত্যি আমাকে টানতে শুরু করে, দড়ি টানা করে। প্রকৃতির সাথে পড়শীর বেশ মিল খায়। পুরোটা না হলেও আমার - স্বভাবের সাথে মিলেই যে ভেতরটাও। ছোট্ট ছোট্ট কথা, কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট সুউচ্চারণে। কোন জড়তা নেই কথাতে। আপাদমস্তক সম্ভ্রান্তের ছাপ। চোখে স্বপ্ন ওর ঘর বাঁধার। সব সময়। তাকিয়ে থাকে কোন অতি চেনা প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায়।

পড়শীকে নিয়ে আমার অনেক ভাবনা। ইদানীং। অনেক একান্ত - । অনেক কথা। ওর আরো অনেক স্বপ্নের কথা। সব কথা তো আর বলা যায় না। আর একদিনেও নয়। মার্কিন মুল্লুকেও পড়শী একটুও বদলায়নি। বাঙালিত্বের অহংকার অসাধারণ লেগেছে আমার কাছে। পড়শীকে নিয়ে আমার অনেক বলার - অনেক কথা বলবো। অন্য একদিন, আরো একদিন, হয়তো।

তবে যে কথাটি আজ না বললেই নয়, প্রিয় পাঠক, পড়শীকে আমার ভাল লেগে গেছে। মানে ইয়ে - আরকি, একটু একটু, তারপর প্রেম। প্রেম থেকে পরিণতি হবে কিনা জানি না। তবে কথা বলা, আদানপ্রদান, ভাব বিনিময়, আরো নিবিড় - গভীর, চলছে। নতুন প্রেম তো।

আমেরিকায় পাত্র-পাত্রীদের কথাই যখন উঠেছে তখন জড়তা কাটিয়েই বলছি - পড়শীকে আমার সাথে মানাবে ভালই মনে হয়। কি বলুন? - পাঠক আর পাত্র হিসেবে আমাকে - ? ০

নিউইয়র্ক,
২৩শে ডিসেম্বর, ২০০১।

বর-কনে খোঁজা
নতুন যুগের নতুন পদ্ধতি

শহীদ আহমেদ

প্রিয় পাঠক, আপনি কি নিঃসঙ্গ? পাত্র খুঁজছেন? অথবা জীবনসঙ্গিনী? নিজের জন্যে, বা কোন প্রিয়জনের জন্যে? বুঝে উঠতে পারছেন না কোথায় যাবেন, কাকে বলবেন? কোন্ কথা কে কিভাবে নেয়, সংকোচ আপনার মনে? আর দ্বিধা নয়, আনন্দ করুন। উপযুক্ত মানুষ খুঁজে পাওয়ার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এখন আপনার হাতের কাছেই। জানেন না, কী সেটা? ইন্টারনেট। হ্যাঁ, ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে সহজেই খুঁজে নিতে পারেন আজ আপনার কাংখিত মানুষটিকে। এই তো সেদিন, আমার এক সহকর্মী জাভেদ হঠাৎ আমার অফিসে ঢুকে হৈচৈ করে জানান দিলো 'মালয়েশিয়া যাচ্ছি। আজ রাতেই।' আমি অবাক হলাম, 'মালয়েশিয়া? কেন? অফিস নতুন ব্রাঞ্চ খুলছে নাকি?' হাহা করে হাসতে লাগলো জাভেদ। 'অফিস না, নতুন চ্যাপ্টার খুলতে যাচ্ছি জীবনের। বিয়ে করছি। মালয়েশিয়ার মেয়ে। ইন্টারনেটে পরিচয়। ডেটও করছি ইন্টারনেটে। আট মাস ধরে। আর না।' সব সহকর্মীকে বিস্ময়ে হতবাক করে জাভেদ সে রাতেই রওয়ানা হলো মালয়েশিয়া। এটা তিন বছর আগের কথা। সেদিন হঠাৎ দেখা, সুখে আছে ওরা, ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে একটা। জিজ্ঞেস করলাম, ইন্টারনেটে মানে কিভাবে তোমাদের পরিচয় হলো প্রথম? হাসতে হাসতে বললো, 'http://www.matrimony.org'। প্রিয় পাঠক, জাভদের মতো আপনিও এই ওয়েব সাইটটি থেকে খুঁজে নিতে পারেন আপনার জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী।

কি বলছেন? এতোটা এ্যাডভেঞ্চারাস হতে চান না? বাংলাদেশী ছেলে চান? দেশী মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবেন না? কোন সমস্যা নেই। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে বেশ কিছু ওয়েব সাইট। চলুন একটা ভারচুয়াল ট্যুর দিয়ে আসা যাক ...

শুরু করি বাংলা ২০০০ দিয়ে। ওদের ঠিকানা ঃ (http://www.bangla2000.com/Matrimonial/Default.asp) দেখা যাক, ভালো কনে পাওয়া যায় কিনা। চমৎকার। ১৮৫ জনের একটা তালিকা বেরিয়ে এলো কয়েক সেকেন্ডেই। এরমধ্যে ১৬৯ জন মুসলমান, ১৬ জন হিন্দু এবং ১ জন অন্য ধর্মের। আর হবু বরদের কি খবর? ওদের সংখ্যাটা একটু বেশি - ৬৯৮ জন মুসলমান, ৯০ জন অন্যান্য ধর্মের। যে কেউ বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। কোন খরচ নেই। বর-কনে খোঁজার এসব ওয়েব সাইটের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হওয়া চাই প্রাইভেসী। বাংলা ২০০০ আপনার ই-মেইল অ্যাড্রেস কাউকে দেবে না। কেউ যদি আপনার বিজ্ঞাপন দেখে আগ্রহী হয়, ওরা জমা রাখবে সব তথ্য এবং আপনাকে জানাবে, আর কাউকে না। এরপর দায়িত্ব আপনার, আপনি কি করে এগুবেন।

জীবনসঙ্গী (http://www.jibonshongi.com) অপেক্ষাকৃত নতুন সাইট। এখানেও ফি লাগে না কোন। তবে ছবি দিতে পারেন বিজ্ঞাপনে। প্রাইভেসীর ব্যাপারেও নিশ্চিত থাকতে পারেন। কেউ জানবে না আপনার ঠিকানা, কিন্তু বিজ্ঞাপনের জবাব ঠিকই চলে আসবে আপনার ই-মেইলে।

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রবাসে ঘটকালী

রঙ্গনাথ

জীবনের সবচেয়ে জটিল ব্যাপার হচ্ছে বিবাহ। যারা বাবা-মার সাহায্য নিয়ে বিয়ে করে তারা খুব ভাগ্যবান। যারা নিজেরা চেষ্টা করে বিবাহ করেছে তারা বোঝে বিবাহ কতখানি ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার।

দেশে যখন ঘটকের মাধ্যমে প্রায় সব বিবাহ হতো তখন বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম ঘটকরা কি করে? সে কারণে ছোটবেলা থেকে বেশ কিছু ঘটকের কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করেছি। অতীতে ঘটকরা কি পেতো জানি না, তবে বর্তমানে আমাদের সমাজে শুধুমাত্র ঘটকালী করে জীবিকা অর্জন করা যায় না। এ সত্ত্বেও এখনও দেখা যায়, অনেকে ঘটকালী করে। অনেকে আবার আগ্রহ সহকারে এ কাজ করতে ভালোবাসে।

একজন ঘটক ভালোমন্দ দুটোরই স্বাদ পেতে পারে। নতুন দম্পতির মধ্যে যখন সবকিছু ভালো যেতে থাকে, ঘটকের তখন সুনামের অন্ত নেই। পাত্র-পাত্রী দু'পক্ষই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তার আদর যত্নের তুলনা হয় না। ঘটকের জন্যই নাকি মেয়েটার সুখের জীবন। ঘটকের জন্যই নাকি একটা 'ভালো ঘরের বউ' পাওয়া গেছে। বিপরীত ক্ষেত্রে, এটা-সেটা নিয়ে যদি কখনও গোলমাল শুরু হয় তখন দেখা যায় ঘটক খুব চুপচাপ। কি হচ্ছে-না হচ্ছে জিজ্ঞেস করলে তাকে হু-হা করে বা না-জানার ভাব করে এড়িয়ে যেতে দেখা যায়। অনেক সময় গালাগালি খাওয়ার ভয়ে তাকে সোজা রাস্তা ত্যাগ করে অনেকটা ঘুরিয়ে যাতায়াত করতে হয়।

বিবাহ মাত্রেই অনিশ্চয়তা থাকে। দুটো না জানা বা অল্প-জানা মানুষ (বা পরিবার) ভবিষ্যতে একে অপরকে কিভাবে গ্রহণ করবে, কতদিন একে অপরকে সহ্য করবে - কিউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না। তবে বাবা-মারা চান ছেলেটার সুখের জীবন যেন হয় এবং ছেলের বউ যেন কখনও তাঁদের পর না ভাবে। জামাই এবং তার সাথে মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ী যেন ভালো হয়, যাতে মেয়েটার কষ্ট না হয়। বাবা-মাদের সবচেয়ে বড় ভয় - শেষ বয়সে নাতী-নাতনীর দায়িত্ব যেন না নিতে হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে প্রায় অল্পবয়সী সব মা-বাবারা চায় তাদের ছেলে-মেয়েদের দায়িত্ব অন্যরা নিক।

যে কোন সম্পর্কের মধ্যে জটিলতা দেখা দিতে পারে। এর উদ্ভব প্রধানত: ব্যক্তি বিশেষের চিন্তা-ভাবনা এবং আচার-ব্যবহার থেকে। বিবাহ পরবর্তী জীবনে স্বামী-স্ত্রীতে বোঝাপড়ায় যদি গরমিল হয় বা তাদের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে যদি মীমাংসা না হয় - সমস্যা ক্রমশঃ বাড়ে। সম্পর্কে যদি সরলতা এবং উন্মুক্ত আলোচনার অভাব থাকে, জটিলতা এবং সন্দেহ-প্রবণতা বাড়তে থাকে, ঝগড়া-কোন্দল শুরু হয়।

বিবাহ-পরবর্তী সমস্যা এড়ানোর জন্যই মনে হয় আমাদের সমাজে অন্যের সাহায্য নেয়া খুব প্রয়োজনীয়। একজন ঘটক তৃতীয় পক্ষ হিসেবে কাজ করে। তার মধ্যস্থতায় অনেক শক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজতর। বিপদের আগেই শক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দরকার।

অতি উন্নত দেশ যেমন যুক্তরাষ্ট্রের মত জায়গায় ঘটকের প্রয়োজন আছে কি? যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে গেলে অনেক বিবাহযোগ্য ছেলেমেয়েদের সাথে দেখা হয়। তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করাতো কোন একটা সমস্যার ব্যাপার নয়। এক পরিবার অন্য পরিবারকে জানে। তবে সমস্যাটা কোথায়? দেশে যেমন এক গ্রামের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কালে-ভদ্রে বিবাহ হতে দেখা যায়। তেমনি এক শহরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিবাহ যে হতে পারে - এ প্রত্যাশা করা উচিত নয়। যদিও কাগজপত্রে কিংবা ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপন দিয়ে দূর-দূরান্তের ছেলে-মেয়েদের যোগাযোগ সম্ভব, আমাদের অনেকের ধারণা বন্ধু-বান্ধব কিংবা বিশ্বস্ত মানুষের মাধ্যমে জানাশোনা বা যোগাযোগ করা অনেকগুণে শ্রেয়।

একজন দেশের ঘটকের পক্ষে প্রচুর সময় দেয়া সম্ভবপর। তাকে প্রচুর কাজ করতে হয়। যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রায় প্রতি ব্যাপারে মধ্যস্থতা তাকেই করতে হয়। ঘটক কখনও চায় না যে সামান্য কোন ব্যাপারে অমিল থাকায় বিবাহ না হোক। বিবাহ হওয়াতেই তার গর্ব এবং সাফল্য। (যেহেতু নিজেরও কয়েকটা ঘটকালী করার সৌভাগ্য হয়েছে, আমার অনুভূতিটা কমবেশি একই রকমের)।

প্রবাসে দু'ধরনের পাত্র-পাত্রী আছে। প্রথম দলের প্রবাসে জন্ম এবং প্রবাসেই শিক্ষা-দীক্ষা। দ্বিতীয় দলের দেশে জন্ম এবং দেশে ও প্রবাসে শিক্ষা-দীক্ষা। বাবা-মারা যারা দেশের সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করেন, তাঁদের চিন্তার সাথে উভয় দলেরই কোন মিল নেই। কে কি চায় এটা একজন আরেকজন বুঝতে পারে না। অনেক সময় বাবা-মা যখন নিজের মতের প্রাধান্য চাপানোর চেষ্টা করেন - সমস্ত ব্যাপারটাই উলট-পালট হয়ে যায়। প্রায় সব বাবা-মারা চান ছেলে-মেয়েরা নিজেদের সংস্কৃতির কদর দিক এবং সম্ভবপর হলে দেশে গিয়ে বিবাহ করুক। দেশে তো ভুরি ভুরি মেয়ে বা ছেলে আছে! অনেক ক্ষেত্রে অনেক পাত্র-পাত্রী দেশে গিয়ে চেষ্টাও করে। অনেকে সার্থক হয়ে ফিরে আসে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চার-পাঁচবার গিয়েও অনেকে সুবিধা করতে পারে না। তারা পছন্দ-অপছন্দের মীমাংসা করতে পারে না।

প্রবাসে পাত্র-পাত্রীদের সমস্যার সমাধান কোথায়? আমরা সবাই যদি ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেই, তাহলে কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে আমাদের যেমন ভাবনা-চিন্তা, বিবাহের ব্যাপারটাও ঠিক তেমন হওয়া উচিত। আমরা যদি ছেলে মেয়েদের সাথে বিবাহের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা না করি, তাহলে তারা আমাদের ইচছা-অনিচছার কথা জানবে কেমন করে? তারা কি চায়, না চায় - তাই বা আমরা জানবো কি করে? সমস্যা এড়াতে গেলে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

আমরা যদি অন্যকে না বলি, অন্যরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কথা জানবে কেমন করে? বন্ধু বা প্রতিবেশীর ছেলে বা মেয়ের জন্য দু'চারটি ভালো কথা অন্যকে বলা আমাদের পক্ষে খুবই সহজ ব্যাপার। যদি দেখি কোন ছেলে বা মেয়ে বিবাহের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য চায়, আমাদের ঘটকালী করতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। ০

রঙ্গনাথ একজন প্রবাসী বাঙালী এবং প্রযুক্তিবিদ। সুযোগ পেলে তিনি মাঝে মাঝে ঘটকালী করেন।

সৈয়দ ইকবালের চোখে ...

বর কনে খোঁজা ... ১৮ পৃষ্ঠার পর

বঙ্গজ (http://www.bongoz.com/matrimonial) খুবই সাদামাটা একটা সাইট। বিজ্ঞাপন আছে কিছু। তবে প্রাইভেসী ওরা বোঝে কিনা বলা মুশকিল!

সে তুলনায় কিন্তু (http://www.kin2.com) যথেষ্ট সতর্ক। বিজ্ঞাপনের জবাব সরাসরি যাবে শুধু আপনার কাছেই। সমস্যা হচ্ছে, ওরা একটু নতুন, ফলে এখনো খুব একটা বড় না ওদের ডাটাবেজ।

তুলনামূলকভাবে বাংলাক্যাফে-র ডাটাবেজ অনেক বড়। ওদের সাইট (http://www.banglacafe.com/matchmaker/index.html)-এ বিজ্ঞাপন আছে হাজারেরও বেশি হবু বর-কনের। বাংলাক্যাফে-র আরেকটা চমৎকার বিষয় ওদের ডিসকাশন বোর্ড। বিজ্ঞাপন দেখে কেউ যদি আগ্রহী হন, শুর করতে পারেন একটা অনলাইন আলাপ, যা দেখতে পারে শুধু দুই পক্ষ - বিজ্ঞাপনদাতা ও ঐ আগ্রহী ব্যক্তিটি।

প্রিয় পাঠক, কি ভাবছেন! এখনো দ্বিধা? বিনে পয়সার এইসব ওয়েব বিজ্ঞাপন, খুব একটা ভরসা পাচ্ছেন না? প্রফেশনাল ঘটক চাই? তাও পাবেন ইন্টারনেটে। সাইটের নাম বাঁধন (http://www.badhon.com)। সুদক্ষ, স্মার্ট, আধুনিক প্রফেশনাল বলতে যা বোঝায়, সবই পাবেন আপনি বাঁধনে। তবে খরচ পড়বে একটু। প্রবাসীদের মাথাপিছু রেজিস্ট্রেশন ফি তিন হাজার টাকা। শুভকাজ সম্পন্ন হলে দিতে হবে তিরিশ হাজার টাকা। টাকার অংকটা খুব ছোট না। কিন্তু ওদের সার্ভিসও সেরকম। ছ'বছরের ব্যবসা ওদের, ইতোমধ্যেই দখল করেছে ব্যাপক পরিচিতি।

অতএব পাত্র-পাত্রীরা আর দেরী কেন? এক্ষুনি ওয়েব সাইটগুলো পরখ করার কাজটা শুরু করে দিতে পারেন। শুভস্য শীঘ্রম ... o

সিলিকন ভ্যালী

ডিসেম্বর ২৪, ২০০১।